নরবানর থেকে মানুষে রূপান্তরে শ্রমের ভূমিকা

ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস

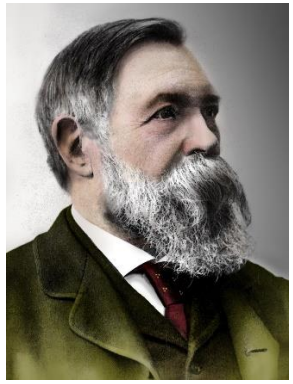

ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস

+

নরবানর থেকে মানুষে রূপান্তরে শ্রমের ভূমিকা

রচনাঃ ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস

রচনাকালঃ ১৮৭৬

মূল জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশঃ নতুন সময় (দি নাইয়ে জাইত), ১৮৯৬ সাল।

ইংরেজী ভাষায় প্রথম প্রকাশঃ প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৩৪ সাল। বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, মস্কো একে কার্ল মার্কস ও ফেডারিখ এঙ্গেলসের নির্বাচিত রচনার দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করে পুন প্রকাশ করে ১৯৫১ সালে। বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয় পিকিঙ এই ইংরেজী সংস্করণটিকে পুনপ্রকাশ করে ১৯৭৫ সালে।

বাংলা ভাষান্তরের জন্য মার্ক্সিস্ট ইন্টারনেট আর্কাইভ ও মার্কস টু মাও ডট কম-এর ইংরেজী কপি দুটি মিলিয়ে নেয়া হয়েছে, প্রথমটি ১৯৩৪ সালে মস্কোতে প্রকাশিত সংস্করণটি থেকে আর দ্বিতীয়টি পিকিঙ ১৯৭৫ সংস্করণ থেকে ইন্টারনেটে সংরক্ষিত হয়েছে।

সিপিএমএলএম বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় অধ্যয়ন গ্রুপ বাংলায় ভাষান্তর ও প্রকাশ করে ২৫ এপ্রিল ২০২৩ সালে। অনলাইনে সর্বহারা পথ ওয়েবসাইট থেকে সবাই এটি পড়তে ও প্রিন্ট করে নিতে পারবেন।

একই রচনার আরেকটি ভাষান্তর রয়েছে যা সলিল কুমার গাঙ্গুলি কর্তৃক ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩ এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তার সাথে এই নতুন অনুবাদ মিলিয়ে দেখা হয়েছে। অনুবাদটি মূলত সঠিক ও পাঠযোগ্য। কিন্তু তাতে বর্তমানে যে শব্দগত বা ভাষাগত পরিবর্তন আনতে হবে বলে আমাদের মনে হয় তার এখতিয়ার কেবল তাদেরই। তাই নতুন অনুবাদ করা হয়েছে। এখানে কোন ভুলভ্রান্তি থাকলে তৎক্ষণাৎ তা সংশোধন করা হবে।।

এই উপযোগী ফল অনেক পিছনে চলে যায় এবং একমাত্র প্রেরণা থাকে বিক্রিতে যে মুনাফা থাকে তা।

ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি যা হচ্ছে বুর্শোয়াদের সামাজিক বিজ্ঞান, প্রধানভাবে ব্যপৃত থাকে উৎপাদন ও বিনিময়ে মানুষের কর্মকান্ডের আশু আকাঙ্খিত সামাজিক ফলাফলের ওপর। যে সামাজিক সংগঠনের এটা তাত্ত্বিক প্রকাশ তার সাথে এটা সামঞ্জস্য বিধান করে। ব্যক্তি পুঁজিপতিরা যখন আশু মুনাফার জন্য উৎপাদন ও বিনিময়ে নিয়োযিত থাকে, কেবল সবচেয়ে কাছাকাছি সবচেয়ে আশু ফলাফল হিসেবে নিতে পারে তারা। ব্যক্তি ক্ষুদ্রশিল্প মালিক অথবা বণিক যখন উৎপন্ন অথবা ক্রীত পণ্য বিক্রি করে, তাতে সে সন্তুষ্ট থাকে, আর পরে পণ্যের আর ক্রেতার কী হয় তা নিয়ে মাথা ঘামায়না। একই ধরণের কর্মকান্ডের প্রাকৃতিক ফলাফলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিউবাতে স্প্যানীয় বৃক্ষ রোপনকারীরা যারা পাহাড়ের ঢালসমূহে জঙ্গল পুড়িয়ে উজার করেছে, সেই ছাই থেকে পর্যাপ্ত সার সংগ্রহ করেছে এক প্রজন্মের উচ্চ লাভজনক কফি গাছের জন্য, এই যে ভারী ক্রান্তীয় বর্ষন পরে অরক্ষিত মাটির ঊর্ধ্ব স্তর ধুয়ে নিয়ে যাবে নগ্ন পাথরকে কেবল ফেলে রেখে তা কি তারা পরোয়া করেছে? প্রকৃতির সাথে সমাজের সম্পর্কের ক্ষেত্রে উৎপাদনের বর্তমান পদ্ধতি প্রধানভাবে ব্যপৃত কেবল আশু ও সবচেয়ে বাস্তব ফলাফল নিয়ে; শেষমেষ দূরবর্তী ফল যখন সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় তখন তারা আশ্চর্য হয়, যা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের, যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য খুবই বিপরীতে রূপান্তরিত হয়, প্রতি দশ বছরের শিল্পচক্রের প্রক্রিয়ায় যা দেখা গেছে এমনকি জার্মানীর এই "ধ্বংস"-এর ক্ষুদ্র এক প্রাথমিক অভিজ্ঞতা হয়েছে; কারো নিজ শ্রমের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা আবশ্যিকভাবে শ্রমিকদের সম্পত্তিহীন করে তোলে যেখানে সকল সম্পদ অধিক থেকে অধিকতরভাবে অ-শ্রমিকদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় ...[পাণ্ডুলিপি অসমাপ্ত]।।

বাংলা ভাষান্তরের ভূমিকা

এঙ্গেলসের এই রচনাটি তাঁর বৃহত্তর রচনা প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতার অংশ। মার্কসবাদের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতায় বিজ্ঞানের সকল শাখার উপর আলোচনা রয়েছে। এ রচনাটি জীববিজ্ঞানের উপর। আমরা রচনাটির সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করব যাতে পাঠক মূল কথাগুলির একটি ধারণা এখানেই পেতে পারেন।

প্রকৃতি থেকে মানুষের জন্ম ও বিকাশের ধারা অনুসরণ করলে আমরা দেখিঃ

সূর্য (৪৫০ কোটি বছর আগে জন্ম), পৃথিবী (সূর্যের সাথে জন্ম), জীবন জগত বায়োস্ফেয়ারঃ জন্ম আনুমানিক ৩৫০ থেকে ৪০০ কোটি বছর আগে, আরএনএ (রাইবোনিউক্লিক এসিড), জন্ম বায়োস্ফেয়ারের সাথে, ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড), জন্ম আরএনএর জন্মের পর একই সময়কালে, এককোষী জীব জন্ম নেয় বায়োস্ফেয়ারের একই সময়কালে, নিউক্লিয়াসযুক্ত এককোষী জীব জন্ম নিল ১৮০ কোটি বছর আগে, বহুকোষী জীব যেমন স্পঞ্জ, জেলিমাছ ইত্যাদি জন্ম নেয় ৬০ কোটি বছর আগে, উদ্ভিদজগত ঐ একই সময়কালে, প্রাণীজগত ঐ একই সময়কালে, মেরুদন্ডী (৫০ কোটি বছর আগে জন্ম), স্তন্যপায়ী (২০ কোটি বছর আগে জন্ম), প্রাইমেট বা আদি বানর হল বানর ও নরবনানরদের লেজযুক্ত আদি পূর্বপুরুষ, জন্ম ৮ কোটি বছর আগে, প্রথমদিকে আকারে ছোট এই প্রাণীরা তাদের স্তন্যপায়ী শ্রেণীগত ভাইবোন ইঁদুর, খরগোশ, বাদুড়, কাঠবিড়ালীদের মত চেহারার ছিল, কিন্তু অবশ্যই বানরের চেহারার ছাপ ধীরে ধীরে রূপ নিতে শুরু করে। প্রাইমেট হ্যাপ্লোরাইনি (সিমিয়ান লেজযুক্ত ও ট্রেইজার লেজযুক্ত এই দুইভাগে বিভক্ত হয়) ও স্ট্রেপ্সিরাইনি (যেমন লেজযুক্ত লেমুর) এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হয় ৬ কোটি বছর আগে। সিমিয়ানদের মধ্যে একদিকে বড় লেজযুক্ত

পাশ্চাত্য আধুনিক বানর, অন্যদিকে ছোট লেজযুক্ত আধুনিক প্রাচ্য বানর (যেমন বেবুন) ও লেজহীন নরবানর হোমিনইডা এই দুইভাগে বিভক্ত হয় প্রায় ৪ কোটি বছর আগে। হোমিনইডা বা নরবানর জন্ম নেয় আড়াই কোটি বছর আগে (যথা ছোট নরবানর গিবন, অন্যদিকে বড় নরবানর হোমিনিডা জন্ম নেয় ১ থেকে ২ কোটি বছর আগে যথাঃ ওরাঙুটান, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, বনবো), নিকট নরবানর হোমিনিনার জন্ম প্রায় ১ থেকে সোয়া কোটি বছর আগে (যথা গরিলা, শিম্পাঞ্জি বনোবো), হোমিনিনি বা নিকটতম নরবানর প্রায় ৬৩ লক্ষ (শিম্পাঞ্জি ও বনবো; আর অন্তর্বর্তী মানুষ-যা সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে আবির্ভূত হল যথা অস্ট্রালোপিথেকাস অ্যাফারেনসিস জন্ম প্রায় ৪২ লক্ষ বছর), হোমো বা মানুষ জন্ম, ২৮ লক্ষ বছরঃ হোমো হ্যবিলিস, এরাই প্রথম হোমো মানুষ, এরাই প্রথম হাতিয়ার তৈরি করে, হোমো ইরেক্টাস জন্ম নেয় ২০ লক্ষ বছর আগে, এরাই প্রথম আগুনের ব্যবহার করে, আফ্রিকা থকে ইউরেশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, এছাড়া হোমো ডেনিসোভান, হোমো নিয়ান্ডারথাল, ... সর্বশেষ হোমো স্যাপিয়েন্স, এরাই মানুষের উন্নত, সর্বশেষ ও একমাত্র জীবিত প্রজাতি, জন্ম ২ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকায়, এদের হাতিয়ার উন্নত, সমাজ উন্নত, মস্তিষ্ক সর্বাধিক বিকশিত, ভাষা ব্যবহার করা শিখেছে, গড়ে তুলেছে পশুপালন, কৃষি, ধাতুবিদ্যা, নৌযাত্রা, শিল্পকারখানা ও ব্যবসাবানিজ্য, জাতি ও রাষ্ট্র, আইন ও রাজনীতি, শিল্পকলা ও দর্শন ইত্যাদি।

ডারউইন অনুসরণ করেছেন জীব থেকে জীবের বিবর্তন, যেখানে মানুষও জীব। এঙ্গেলস অনুসরণ করেছেন জীব থেকে জীব মানুষের বিবর্তন, যে জীবজগতের অংশ হয়েও কীভাবে আলাদা হয়ে গেল। এখানে প্রধান ভূমিকায় ছিল শ্রম, যার মাধ্যমে আধুনিক মানুষ জীব গড়ে উঠলঃ যে এক পরিপুর্ণ সামাজিক জীব। এঙ্গেলস নরবানর যথা গরিলা, শিম্পাঞ্জি, বনবোদের থেকে আলোচনা শুরু করেছেন,

এই ফলসমূহকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার সুযোগ অর্জন করেছি। এই পরিচালনার জন্য স্রেফ জ্ঞানের চেয়েও বেশি কিছু লাগে। এর জন্য দরকার আমাদের বিদ্যমান উৎপাদন পদ্ধতির আর আমাদের সমগ্র সমকালীন সামাজিক ব্যবস্থায় এক পূর্ণ বিপ্লব।

এযাবতকালে অস্তিত্বশীল সকল উৎপাদন পদ্ধতির লক্ষ্য ছিল স্রেফ শ্রমের আশু ও প্রত্যক্ষ উপযোগী ফল অর্জন করা। দূরবর্তী ফল যা কেবল পরে আবির্ভূত হয় আর ক্রমিক পুনরাবৃত্তি ও সঞ্চয়ের মধ্যে কার্যকর হয় তা ছিল সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত। ভুমির আদি সাধারণ মালিকানা মানবজাতির বিকাশের একটা স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেখানে দৃষ্টিসীমা সীমিত ছিল আশুভাবে যা পাওয়া যায়, অন্যদিকে অনুমান করত এই আদি ধরণের অর্থনীতির কুফলকে কিছু উদ্বৃত্ত ভুমির সাহায্যে অতিক্রম করা যেতে পারে। যখন উদ্বৃত্ত জমি নিঃশেষ হয়ে গেল, সাধারণ মালিকানারও অবনতি ঘটল। সকল উচ্চতর ধরণের উৎপাদন জনগণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত করল, আর এভাবে শাসক ও নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের মধ্যে বৈরিতার দিকে নিয়ে গেল। এভাবে শাসক শ্রেণীর স্বার্থ উৎপাদনের চালিকাশক্তিতে পরিণত হল যেহেতু নিপীড়িত জনগণের জন্য শুধু বেঁচে থাকার উপকরণ দেয়ার মধ্যে উৎপাদন আর বিধিবদ্ধ থাকলনা।

এটা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা হয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে যা পশ্চিম ইউরোপে প্রধানভাবে আধিপত্য করছে। ব্যক্তি পুঁজিপতি যারা উৎপাদন ও বিনিময়ে আধিপত্য করে, তারা তাদের তৎপরতার সবচেয়ে আশু ফল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে। যে মাত্রায় উৎপাদন ও বিনিময় হওয়া জিনিসটার উপযোগিতা আছে,

আমরা আলু ও তার ফল হিসেবে লসিকাস্ফীতি রোগের বিস্তারের কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু শ্রমিকদের শুধু আলু খেয়ে বেঁচে থাকার পর্যায়ে টেনে আনার ফলে সমগ্র দেশে ব্যাপক জনগণের জীবনযাত্রায় তা কী পরিবর্তন আনল, অথবা ১৮৪৭ সালে আয়ারল্যান্ডে দুর্ভিক্ষ আনে যে আলুর রোগ যা দশ লাখ আইরিশ জনগণকে কবরে প্রেরণ করেছে, আলু খাদ্যের ওপর সম্পূর্ণ অথবা প্রায় নির্ভরশীল হওয়ার কারণে আরো ২০ লাখ জনগণকে অভিবাসী হতে হয়েছে সেই তুলনায় লসিকাস্ফীতি আর কী? যখন আরবরা মদ পাতন করতে শিখল তাদের মাথায় কখনো আসেনি যে তখনো অনাবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশের আদিবাসীদের খতম করার একটি প্রধান অস্ত্র তারা তৈরি করেছে। পরে যখন কলম্বাস এই আমেরিকা আবিষ্কার করে, সে জানলনা যে এটা করে কৃষ্ণাঙ্গ দাস ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে দাসত্বের নতুন ধরণ তৈরি করে ফেলল, ইউরোপে যে দাসপ্রথার পতন দীর্ঘকাল আগেই ঘটেছে। সতের ও আঠার শতকে যারা শ্রম দিল বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরিতে, তাদের কোন ধারণা ছিলনা তারা এমন যন্ত্র তৈরি করছিল যা অন্যসব কাজের চেয়ে বেশি দুনিয়া জুড়ে সামাজিক সম্পর্কের বিপ্লবীকরণ করবে। বিশেষত ইউরোপে মুস্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত করে আর ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠকে বঞ্চিত করে। যন্ত্রটি প্রথমে বুর্শোয়াদের হাতে সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রদানেই সীমিত ছিল, কিন্তু পরে বুর্শোয়া ও সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম জন্ম দেয় যা বুর্শোয়ার উচ্ছেদ ও শ্রেণীবিরোধের অবসানের মাধ্যমেই কেবল সমাপ্ত হতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও, দীর্ঘ ও নির্মম অভিজ্ঞতার দ্বারা ও ঐতিহাসিক বস্তুর সংগ্রহ ও বিস্তারের মাধ্যমে আমাদের উৎপাদন কর্মকান্ডের পরোক্ষ অধিকতর দূরবর্তী সামাজিক ফলের একটি পরিপক্ক দৃষ্টি অর্জনে ক্রমান্বয়ে শিখছি আমরা এবং

এরা হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে কাছের জীবগোষ্ঠী যারা প্রকৃতপক্ষে বানর-নরবানর গোষ্ঠী থেকে মানুষে রূপান্তরের মধ্যবর্তী স্তর। অন্তর্বর্তীকালে নরবানরেররা হাঁটার সময় হাতের ভূমিকা ছেড়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকা আয়ত্ব করতে লাগল, নরবানর থেকে মানুষে রূপান্তরে এ ছিল এক নির্ধারক পদক্ষেপ।

অন্তর্বর্তীকালে হাতের ব্যবহার ছিল খাদ্য সংগ্রহ ও ধরে রাখা, গাছে বাসা ও ছাদ তৈরি করা। এরা হাত দিয়ে লাঠি ধরে শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে, শত্রুকে ফল ও পাথর ছুড়ে বিতাড়িত করে। মানুষের হাত কত শ্রেষ্ঠতর! সে পাথরের হাতিয়ার তৈরি করল। সে হাতিয়ার আদিতে ছিল স্থূল। যতই মানুষের প্রজাতিগত প্রতিটি বিকাশের সাথে সে হাতিয়ারও সূক্ষ থেকে সূক্ষতর হয়েছে। মানুষের হাত যেমন শ্রমের অঙ্গ, তেমনি শ্রমের ফসলও। হাতের প্রতিক্রিয়া সমস্ত শরীরে ঘটে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে আন্তসম্পর্ক রয়েছে। একটির বিকাশের প্রতিক্রিয়ায় অন্যগুলিরও বিকাশ ঘটে।

নরবানর যূথবদ্ধ। এ থেকে নিবিড় বন্ধন গড়ে উঠে। এক সময় পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য কিছু কথা বলার প্রয়োজন হল। স্বরযন্ত্রের বিকাশ ঘটল, স্পষ্ট ধ্বনি সৃষ্টি ও ভাষা গড়ে উঠল। ভাষা হল প্রাণীদের থেকে মানুষে পরিষ্কার পার্থক্য। প্রথমে শ্রম, এর সাথে কথা বলার প্রেরণায় মস্তিষ্কের বিকাশ হয়ে বড় ও নিখুঁত মানুষের মস্তিষ্কে পরিণত হল। মস্তিষ্কের বিকাশের সাথে ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ঘটলঃ যথা স্পর্শ, ঘ্রাণ ও চোখ। মস্তিষ্কের বিকাশ থেকে সচেতনতার বিকাশ, বিমূর্তায়ন ও সিদ্ধান্ত টানার ক্ষমতা জন্ম নিল। যূথবদ্ধতা নিবিড়তর হতে হতে সমাজের উদ্ভব ঘটল। এ পর্যন্ত শ্রমই হচ্ছে পার্থক্য। নরবানরদের ছিল খাদ্যসংগ্রহের এলাকার সীমাবদ্ধতা। তারা নিজ বর্জ্য দ্বারা ভূমি উর্বর করা ছাড়া আর কোন ভূমিকা

রাখতে পারত না, শুধু খেয়ে শেষ করত, ফলে তাদের জনসংখ্যা বাড়তনা, বড়জোর একই থাকত। শিকারী অর্থনীতির আবির্ভাবে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার্য উদ্ভিদের সংখ্যা বাড়ে, উদ্ভিদের ভোজ্য অংশ খাওয়া আরো বাড়ে। শরীরে ঢুকে এমনসব উপাদান যা ছিল মানুষে রাসায়নিক রূপান্তরের পূর্বশর্ত। হাতিয়ার তৈরির মাধ্যমে সত্যিকার শ্রমের সূচনা ঘটে। প্রাচীন হাতিয়ার ছিল শিকার ও মাছ ধরার হাতিয়ার, যার মধ্যে প্রথমটি আবার অস্ত্রও। সবজিভোজী থেকে এর সাথে মাংসভোজী খাদ্য হজমের সময় কমায়, দৈহিক শক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রাখে। এর সাথে আসে আগুণের ব্যবহার ও প্রাণীদের পোষ মানানো, প্রথমটি হজমের সময় আরো কমায়, দ্বিতীয়টি হয় নতুন মাংসের যোগান ও নতুন খাদ্য উৎসঃ দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য যা পুষ্টিতে মাংসের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সকল জলবায়ুতে বাঁচতে শেখা। গ্রীস্মকালীন থেকে শীতকালীন। শীত ও স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে প্রয়োজন হল আশ্রয় ও কাপড়। মানুষ প্রাণী থেকে আরো আলাদা হয়ে গেল। হাত, কথার অঙ্গ ও মস্তিষ্কের সম্মিলিত কার্যকলাপ দ্বারা শিকার ও পশুপালনের সাথে যুক্ত হল কৃষি, তারপর জন্ম নিল সূতাকল, ধাতুনির্মাণ, মৃৎশিল্প, নৌযাত্রা, তারপর ব্যবসা ও শিল্প, তারপর শিল্পকলা ও বিজ্ঞান, তারপর জাতি ও রাষ্ট্র, আইন ও রাজনীতি, মানববস্তুর কল্পিত প্রতিফলন ধর্ম। সবকিছু চাহিদার বদলে চিন্তা থেকে উদ্ভূত বলে চালাতে জন্ম নিল ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী। এই ভাববাদী দৃষিভঙ্গীর কারণেই ডারউইনবাদীদের অধিকাংশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী মানুষের উদ্ভবে শ্রমের ভূমিকা স্বীকার করেননা। প্রকৃতির পরিবর্তন মানুষ ঘটায়, শ্রমই সে পার্থক্য ঘটায়। প্রকৃতিও প্রতিক্রিয়া করে। মানুষ প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়, প্রকৃতির প্রভু সাজার চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ আসলে প্রকৃতির অংশ মাত্র। সে প্রকৃতির ক্ষতি করার পর প্রকৃতিও পালটা আক্রমণ চালায়। মানুষ কখনোই জানত না তারা কী করছে,

ইউরোপে আলু ছড়িয়েছে তারা সচেতন ছিলনা যে এই শ্বেতসারপূর্ণ কান্ডের সাথে তারা লসিকাস্ফীতি (স্ক্রফুলা) রোগও ছড়াচ্ছিল। তাই প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা কোনভাবেই প্রকৃতির কোন শাসক নই—বিদেশীদের ওপর বিজেতা যেমন, এমন লোক যারা প্রকৃতির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, বরং আমরা রক্তমাংস ও মস্তিষ্ক সহকারে প্রকৃতির অংশ, এর মধ্যেই আমরা অস্তিত্বশীল, আর এর মধ্যে আমাদের সকল প্রভুত্বের অর্থ হচ্ছে সকল জীবের মধ্যে আমাদের এই সুবিধা যে আমরা প্রকৃতির নিয়ম শিখতে ও প্রয়োগ করতে পারি সঠিকভাবে।

আর বস্তুত প্রতিদিন আমরা এই নিয়মসমূহকে আরো ভাল করে বুঝতে পারছি, আর প্রকৃতির প্রচলিত প্রক্রিয়ায় আমাদের হস্তক্ষেপের অধিকতর আশু ও দূরবর্তী ফলসমূহ আত্মস্থ করতে পারছি। নির্দিষ্টভাবে বর্তমান শতাব্দীতে প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রচন্ড বিকাশের পর অন্তত আমাদের দৈনন্দিন উৎপাদন কর্মকান্ডের অধিকতর দূরবর্তী ফলসমূহের উপলব্ধি ও নিয়ন্ত্রণ করতে আমরা অনেক বেশি সক্ষম। কিন্তু এই উন্নতি যত বেশি হবে ততই মানুষ প্রকৃতির সাথে একত্ব শুধু অনুভব নয়, জানবেও; আর অধিকতর অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে মন ও বস্তুর মধ্যেকার, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার, আত্মা ও শরীরের মধ্যকার বৈপরিত্যের নির্বোধ ও অবাস্তব ভাবধারা যা ইউরোপে প্রাচীন যুগের অবনতির পর উদ্ভূত হয়েছিল আর খৃষ্টত্বের মধ্যে যার সর্বাধিক মূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিকতর দূরবর্তী *প্রাকৃতিক* ফলাফল হিসেব করা কিছুটা শিখতে আমাদের হাজার হাজার বছর লেগেছে, কিন্তু এই তৎপরতাগুলোর অধিকতর দূরবর্তী সামাজিক ফলাফল জানতে আরো অনেক কঠিন ছিল।

বেশি সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি। কিন্তু সকল প্রাণীদের পরিকল্পিত তৎপরতা পৃথিবীর ওপর তাদের ইচ্ছাকে প্রথিত করতে কখনই সক্ষম হয়নি। তা মানুষের জন্য বাকি ছিল।

সংক্ষেপে প্রাণীরা স্রেফ তার পরিবেশকে *ব্যবহার করে,* স্রেফ তার উপস্থিতির দ্বারা এর মধ্যে পরিবর্তন আনে, কিন্তু মানুষ তার পরিবর্তনকে দিয়ে প্রকৃতিকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগায় আর প্রকৃতির ওপর *প্রভুত্ব করে*। এই হচ্ছে মানুষ ও প্রাণীদের মধ্যে চূড়ান্ত ও অপরিহার্য পার্থক্য, আর পুনরায় শ্রমই সে পার্থক্যকে জন্ম দিয়েছে।

প্রকৃতির ওপর আমাদের মানুষের বিজয়ের ব্যাপারে আমরা যেন অতি আত্মপ্রসাদ লাভ না করি। এরকম প্রতিটা বিজয়ের জন্য প্রকৃতি আমাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়। এটা সত্য যে প্রতিটি বিজয় প্রথমে আমাদের আশানুরূপ ফল এনে দেয়, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন অনাকাঙ্খিত ফল আনে যা প্রায়শই প্রথম ফলকে বাতিল করে দেয়। সেই লোকেরা যারা মেসোপটেমিয়া, গ্রীস, এশিয়া মাইনর ও সর্বত্র বনজঙ্গল ধ্বংস করেছে চাষযোগ্য জমি পেতে, তারা স্বপ্নেও ভাবেনি যে বনজঙ্গলসমেত আর্দ্রতার সংগ্রহকেন্দ্র ও সংরক্ষণশালা অপসারণ করে তারা ঐ দেশগুলির বর্তমান জনশূন্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল, যখন আল্পসের ইতালিয়রা দক্ষিন মালভূমির পাইন বনাঞ্চল উজার করে সযত্নে উত্তর মালভূমিতে তা রক্ষা করে আসছিল তাদের সামান্য ধারণাও ছিলনা যে এর মাধ্যমে তারা নিজ অঞ্চলের দুগ্ধশিল্পের মূলোৎপাটন করছিল; তাদের আরো কম ধারণা ছিল যে এভাবে তারা বছরের অধিকাংশ সময়ের জন্য পাহাড়ী ঝর্ণাধারাও বন্ধ করে দিচ্ছিল যা কিনা সমতলভূমির জন্য বর্ষাকালে ভয়ংকর বন্যা আনয়ন করছিল। যারা

বনজঙ্গল কেটে এক অঞ্চলকে খালি করে আরেক অঞ্চল সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে স্থায়ী বন্যা ডেকে আনছে, পরিবেশের আর্দ্রতা কমিয়ে ফেলছে। নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ নিয়ে খাদ্যের বিশাল সম্ভার তৈরি করে একদিকে মানুষকে বাঁচিয়েছে, আবার ঐ উদ্ভিদ থেকে রোগে মানুষের বিলোপ ঘটেছে। বনজঙ্গল কেটে কফি উৎপাদন করার মাধ্যমে আমেরিকা মহাদেশের আদি বাসিন্দাদের বিলোপের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আমেরিকা আবিষ্কারের মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গ দাস ব্যবস্থা পত্তন করেছে, যে দাসব্যবস্থা ইউরোপে অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়েছিল। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মত আবিষ্কার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাল। শিল্প কারখানার উদ্ভব ঘটল। নতুন বুর্শোয়া সমাজের উদ্ভব ঘটল। এই সমাজে উৎপাদন প্রথমে আশু ফলকে কেন্দ্র করেই হয়, কিন্ত দ্রুতই উপযোগিতা পেছনে চলে যায়, সামনে আসে মুনাফা। মুনাফার জন্য এই সমাজের উৎপাদন ধাবিত হয়। এখানেও বুর্শোয়ারা জানেনা তারা কী করছে, কী দূরবর্তী ফল বয়ে আনছে। এরা জানেনা এই পন্য যারা উৎপাদন করে বা যারা ভোগ করে তাদের কী পরিণতি ঘটছে। এই সমাজে যারা শ্রম করে তাদের হাতে সম্পদ থাকেনা, বরং শোষক বুর্শোয়াদের হাতে সকল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। তাই বিপ্লবের মাধ্যমে এই সমাজের বিলোপের প্রয়োজন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ হচ্ছে বর্তমান বাস্তবতা।।

কেন্দ্রীয় অধ্যয়ন গ্রুপ

বাংলাদেশের সাম্যবাদী পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী

২৫ এপ্রিল ২০২৩

নরবানর থেকে মানুষে রূপান্তরে শ্রমের ভূমিকা

[টীকাঃ প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়সূচিতে এঙ্গেলসের একটি নিবন্ধের শিরোনাম ছিল এটি। এটা মূলত এঙ্গেলস রচনা করেছিলেন "দাসত্বের তিন মৌলিক ধরণ" শিরোনামে একটি ব্যাপকতর রচনার সূচনা হিসেবে। এই শিরোনামটি পরে এঙ্গেলস পরিবর্তন করে বানিয়েছেন "শ্রমিকদের দাসত্বে আবদ্ধকরণ, সূচনা"। লেখাটি তারপর অসমাপ্তই রয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত এঙ্গেলস উক্ত রচনার সূচনা অংশের শিরোনাম দিলেন "নরবানর থেকে মানুষে রূপান্তরে শ্রমের ভূমিকা" যা ছিল ঐ রচনার পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই নিবন্ধটি সম্ভবত ১৮৭৬ সালে লেখা। এই ধারণার প্রমাণ হচ্ছে উ লিবনেখটের এঙ্গেলসের প্রতি ১০ জুন ১৮৭৬ সালে লেখা একটি চিঠি যাতে লিবনেখট লেখেন যে অন্য আরো কিছুর মধ্যে তিনি এঙ্গেলসের রচনা "দাসত্বের তিন মৌলিক ধরণ"-এর জন্য অধৈর্যভাবে অপেক্ষারত, যা তিনি গণরাষ্ট্র (ফক্সস্ট্যাট) পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কেবল ১৮৯৬ সালেই এই নিবন্ধটি নতুন সময় (দি নাইয়ে সাইত) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (বর্ষ ১৪, সংখ্যা ২, পৃ ৫৪৫-৫৪)।]

রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদেরা বলেন, শ্রম হচ্ছে সকল সম্পদের উৎস। আর সেই প্রকৃতির পরেই এর স্থান, যে তাকে সেই বস্তু সামগ্রী দেয় যাকে সে সম্পদে রূপান্তর করে। কিন্তু এ এমনকি অপরিসীমভাবে এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তার খোঁজ ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের কুকুরদের মধ্যে এত ভিন্নতা আর অসংখ্য জাতের ঘোড়াদের প্রজননের পূর্বপুরুষ কোন বন্যপ্রাণীরা ছিল তা নিয়ে এখনো বিতর্ক রয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখেনা আমাদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক করার কোন ইচ্ছা নেই যে প্রাণীরা পরিকল্পিত ও পূর্ব সিদ্ধান্তে কাজ করতে পারে। বরং বিপরীতে ভ্রূনের মধ্যে যেখানেই প্রোটোপ্লাজম, জীবন্ত প্রোটিন রয়েছে, সুনির্দিষ্ট বাহ্যিক প্রভাবকের প্রভাবে সেখানেই পরিকল্পিত ধরণের কাজ ভ্রূণাকারে রয়েছে, অস্তিত্ব ও প্রতিক্রিয়া রয়েছে, অর্থাৎ সরলতম হলেও সুনির্দিষ্ট কর্মতৎপরতা রয়েছে। এমন বিক্রিয়া ঘটে এমনকি যেখানে কোষই নেই, স্নায়ুতো দূরের কথা। সম্পূর্ণ অসচেতনভাবে হলেও পোকাখেকো লতারা যেমন শিকার ধরে একদিক থেকে তা পরিকল্পিত ক্রিয়ার মতই আবির্ভূত হয়। প্রাণীদের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশের সমানুপাতে বাড়ে সচেতন ও পরিকল্পিত কাজের ক্ষমতা। আর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তা যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। ইংল্যান্ডে শৃগাল শিকার থেকেই প্রতিদিন দেখতে পাবেন কীভাবে শৃগালেরা এলাকার চমৎকার জ্ঞান ব্যবহার করে শিকারীকে ধোঁকা দিতে আর ভুমির সকল বৈশিষ্ট্যকে সে কত চমৎকার জানে যা তার গন্ধকে মুছে দেয়। আমাদের গৃহপালিত পশুদের মধ্যে মানুষের সাথে সম্পর্কের কারণে শিশুদের সমপর্যায়ের চাতুর্য আমরা প্রত্যহ দেখে থাকি। যেমন মাতৃগর্ভে মানব ভ্রূনের বিকাশ হচ্ছে পোকা থেকে শুরু হয়ে আমাদের প্রাণী পূর্বপুরুষদের কোটি কোটি বছরের শারীরিক বিকাশের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি। তেমনি মানব শিশুর মানসিক বিকাশও আমাদের একই পূর্বপুরুষদের, অন্তত শেষের দিকেরগুলির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের আরো

করেনা। যেমনটা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, প্রাণীরা মানুষের সম পরিমাণ না হলেও একইভাবে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায়, এই পরিবর্তন এক পর্যায়ে পরিবর্তনকারীদের ওপর প্রতিক্রিয়া ঘটায় ও পরিবর্তনকারীদেরই পরিবর্তন ঘটায়। প্রকৃতিতে কোন কিছুই বিচ্ছিন্নভাবে ঘটেনা। প্রতিটি জিনিস একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জটিল গতি ও আন্তক্রিয়া ভুলে যাওয়ায় আমাদের প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা সরলতম জিনিসগুলি পর্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে ব্যর্থ হন। আমরা দেখেছি কীভাবে ছাগলেরা গ্রীসে বনাঞ্চল পুনর্জন্মে বাঁধা দিয়েছে, সেন্ট হেলেনা দ্বীপে ছাগল ও শুকরছানার প্রথম চালান এর প্রাচীন বনাঞ্চলকে খেয়ে প্রায় সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে সফল হয়েছে, আর এভাবে পরবর্তী নাবিক ও উপনিবেশকারীদের দ্বারা আনীত উদ্ভিদের প্রসারের জমি প্রস্তুত করেছে। কিন্তু প্রাণীরা তাদের পরিবেশে অনিচ্ছাকৃতভাবে এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবে সৃষ্টি করে, আর তারা নিজেরা অনেক সচেতন থাকলেও তা আকস্মিকভাবে ঘটে। মানুষ যতই প্রাণীদের থেকে আলাদা হতে থাকে, ততই প্রকৃতির ওপর তাদের প্রভাব পূর্বসিদ্ধান্তকৃত পরিকল্পিত তৎপরতায় রূপ নেয় যার শেষ যেন আগেই নির্ধারিত। প্রাণীরা একটা এলাকার বনজঙ্গল ধ্বংস করে সে কী করছে তা না বুঝেই। মানুষ তা করে ফসলের ক্ষেত বানানোর জন্য চারা রোপন করে অথবা গাছ লাগাতে বা আঙ্গুর বাগান করতে যা সে জানে বহুগুণ বেশি ফসল দেবে। সে একদেশ থেকে অন্য দেশে প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ ও গৃহপালিত পশু স্থানান্তর করে, এভাবে সমগ্র মহাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত বদলে দেয়। শুধু তাই নয়, মানুষের হাত কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের এত পরিবর্তন ঘটায় যে তাদের আর চেনা যায়না। যে সমস্ত জংলী গাছ থেকে আমাদের শস্যবৈচিত্র্য উদ্ভূত হয়েছে

এটা সকল মানব অস্তিত্বের মুখ্য মৌলিক শর্ত, আর তা এমন এক মাত্রায় যে আমাদের বলতে হয়, শ্রমই মানুষকে সৃষ্টি করেছে।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে, পৃথিবীর ইতিহাসের সেই সময়কালকে ভূতাত্ত্বিকেরা তৃতীয় ভূতাত্তিক যুগ (টারশিয়ারী যুগ) বলে থাকেন, সে যুগের এখনো নির্ণীত হয়নি এমন এক সময়কালে, খুব সম্ভবত সেই যুগের শেষের দিকে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের দিকে কোন এলাকায় নর সদৃশ বানরদের একটি উচ্চ বিকশিত প্রজাতি বাস করত, সম্ভবত তা ছিল একটা বিরাট মহাদেশ যা এখন ভারত মহাসাগরের তলে ডুবে গেছে। ডারউইন আমাদের এই পূর্বপুরুষদের একটি সম্ভাব্য বর্ণনা দিয়েছেন। তারা সম্পূর্ণভাবে পশমে আবৃত, তাদের ছিল দাঁড়ি ও খাড়া কান, আর তারা দলবদ্ধভাবে গাছে বাস করত। *[দেখুন চার্লস ডারউন, মানুষের আবির্ভাব, ও যৌন সম্পর্কিত নির্বাচন, লন্ডন, খণ্ড ১, ১৮৭১ সাল, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ মানুষের সম্পর্ক ও বংশতালিকা]*

প্রথমত, তাদের জীবন ধারণের উপায়ের আশু ফল হিসেবে অর্থাৎ গাছ বেয়ে উঠার কারণে হাতের ভূমিকা পায়ের চেয়ে পৃথক ছিল, এই নরবানরেরা সমতলে হাঁটার সময় হাত ব্যবহার করার অভ্যাস ছেড়ে দিতে শুরু করল আর বেশি করে সোজা দাঁড়িয়ে থাকা আয়ত্ব করতে লাগল। এটা ছিল *নরবানর থেকে মানুষে রূপান্তরে নির্ধারক পদক্ষেপ*।

বিদ্যমান সকল নর সদৃশ বানরেরা সোজা দাঁড়াতে পারে আর পায়ের ওপর হাঁটতে পারে, কিন্তু কেবল জরুরী প্রয়োজনে আর আনাড়ীভাবে। স্বাভাবিক চলাফেরা হল আধা সোজা যেখানে হাতের ব্যবহার রয়েছে। তারা হাতের মুঠোর গিঁটের ওপর সবচেয়ে বেশী ভর দিয়ে পা তুলে দীর্ঘ বাহুর সাহায্যে শরীর হেলে দুলে

চলে যেন পঙ্গু মানুষ ক্রাচে ভর দিয়ে চলছে। সাধারণভাবে চারপায়ে হাঁটা থেকে দুই পায়ে হাঁটার অন্তর্বর্তীকালীন সকল রূপই নরবানরদের মধ্যে আজো আমরা দেখতে পাই। দুই পায়ে চলাফেরাটি তাদের কারোর কাছে অস্থায়ীর বেশী কিছুনা।

এটা যৌক্তিক কথা যে যদি আমাদের পশমী পূর্বপুরুষদের সোজা হয়ে চলাফেরা যদি প্রথম নিয়ম হয়, তারপর সময় হলে একটি আবশ্যকতা, তাহলে হাতের উপর নানা বিচিত্র কাজের ভার এর মধ্যেই পড়ে থাকবে। নরবানরদের মধ্যে ইতিমধ্যেই হাত ও পায়ের কাজে লাগানোর পন্থার মধ্যে কিছু পার্থক্য তৈরি হয়েছে। পূর্বেই যেমনটা উল্লেখিত হয়েছে, বেয়ে উঠার ক্ষেত্রে হাত ও পায়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হাত ব্যবহৃত হয় খাদ্য সংগ্রহ ও ধরে রাখতে যেমনটা নিম্নতর স্তন্যপায়ীদের সামনের থাবা আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অনেক নরবানর তাদের হাত ব্যবহার করে গাছে বাসা বানাতে, এমনকি যেমন শিম্পাঞ্জি গাছের শাখাপ্রশাখাগুলোর মধ্যে ছাদ তৈরি করে যাতে আবহাওয়ার থেকে নিজেদের রক্ষা করা যায়, এরা হাত দিয়ে লাঠি ধরে শত্রুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে অথবা শত্রুকে ফল ও পাথর ছুঁড়ে বিতাড়িত করে। বন্দী অবস্থায় তারা মানুষকে অনুকরণ করে বেশ কিছু সাধারণ কাজ করতে হাত ব্যবহার করে। এখানেই দেখা যায় লক্ষ লক্ষ বছরের শ্রমের মাধ্যমে উচ্চতরভাবে নিখুঁত মানুষের হাতের মধ্যে সবচেয়ে অবিকশিত হাত আর সর্বাধিক মানব সদৃশ নরবানরের হাতের মধ্যে কত বিশাল ব্যবধান। হাঁড় ও পেশির সংখ্যা ও গঠন সাধারণত উভয় ক্ষেত্রে একই, কিন্তু সর্বনিম্ন বর্বরের হাতও এমন শত শত কাজ করতে পারে যা কোন বানরই করতে পারেনা। বানরদের হাত একটি স্থূলতম পাথরের ছুরিও তৈরি করতে পারেনি।

হাত, কথার অঙ্গ ও মস্তিষ্কের সম্মিলিত কার্যকরিতা দ্বারা মানুষ শুধু স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে নয়, বরং সমাজেও জটিল থেকে জটিলতর কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয়েছে, নিজেদের প্রতিষ্ঠায় আর উচ্চ থেকে উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। প্রতিটি প্রজন্মের কাজ নিজেই স্বতন্ত্র হয়েছে, অধিক নিঃখুত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়েছে। শিকার ও পশুপালনের সাথে কৃষি যুক্ত হয়েছে; তারপর এল সুতাকল, বুনন শিল্প, ধাতব নির্মাণ, মৃৎশিল্প ও নৌযাত্রা। ব্যবসা ও শিল্পের সাথে শিল্পকলা ও বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত আবির্ভূত হল। ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহ জাতি ও রাষ্ট্রে পরিণত হল। আইন ও রাজনীতি আবির্ভূত হল, আর সাথে আবির্ভূত হল ধর্ম যা হল মানব মনে মানব বস্তুর কল্পিত প্রতিফলন। এইসব ছবির সম্মুখে যা মনের ফসল হিসেবে প্রাথমিকভাবে আবির্ভূত হয়ে সমাজকে শাসন করছিল মনে হয়, শ্রমিকের হাতের অধিকতর বিনয়ী উৎপাদন পিছু হটল, সমাজের বিকাশের আদিম স্তরে (উদাহারনস্বরূপ ইতিমধ্যে আদিম পরিবারে) মন যখন থেকে শ্রম সক্ষমতার পরিকল্পনা করে, নিজের হাত দিয়ে তা না করে অন্যের হাত দ্বারা সেই শ্রম করার পরিকল্পনা করল। সভ্যতার দ্রুত অগ্রগমনের সকল দায় চাপানো হয়েছে মনের উপর আর মস্তিষ্কের বিকাশ ও কর্মকান্ডের উপর। মানুষ তার কর্মৎতপরতাকে নিজেদের সকল ক্ষেত্রে যা মনে প্রতিফলিত হয়ে চেতনায় আসে সেই চাহিদার বদলে চিন্তা থেকে উদ্ভূত বলে চালাতে অভ্যস্ত হল; এভাবে কালক্রমে ভাববাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী জন্ম নিল যা বিশেষভাবে প্রাচীন যুগের অবসানের পর থেকে মানুষের মনের উপর আধিপত্য করেছে। এটা তাদের উপর এমন এক মাত্রায় এখনো আধিপত্য করছে যে ডারউইনীয় মতবাদের অধিকাংশ বস্তুবাদী প্রকৃতি বিজ্ঞানীরাই মানুষের উদ্ভবের পরিষ্কার ধারণা দিতে পারেনা, কারণ উক্ত মতাদর্শিক প্রভাবে তারা শ্রমের পালিত ভূমিকা স্বীকার

দশম শতাব্দীতেও তাদের পিতামাতার মাংস খেত) সৃষ্টি করে থাকে তবু আজকে এর কোন তাৎপর্য নেই।

মাংসভোজী খাদ্যাভ্যাস নির্ধারক গুরুত্বের দুই অগ্রগমন তৈরি করেছে—আগুনের ব্যবহার ও প্রাণীদের পোষ মানানো। প্রথমটি আরো সংক্ষিপ্ত করেছে হজম প্রক্রিয়াকে, এটা মুখে প্রস্তুত খাদ্যকে যোগান দিয়েছে যেন অর্ধেক হজম আগেই হয়ে গেছে, দ্বিতীয়টি শিকারের পাশাপাশি মাংসের প্রাচুর্য বাড়িয়েছে, আর নতুন অধিক ও নিয়মিত উৎস দুধ ও এর জাত দ্রব্যকে সরবরাহ করল যা নতুন শাখার খাদ্য, অন্তত উপাদানে মাংসের মতই মূল্যবান! এভাবে এই এই উভয় অগ্রগমন প্রত্যক্ষ্যভাবে মানুষের জন্য মুক্তির নতুন উপায় হল। মানব ও সমাজের বিকাশের জন্য বিরাট গুরুত্ব সত্ত্বেও তাদের পরোক্ষ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।

মানুষ যেমন ভোজ্য সবকিছু হজম করতে শিখেছে, সে যে কোন জলবায়ুতে বাস করতেও শিখেছে। সে বাসযোগ্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়েছে, সেই একমাত্র প্রাণী যে স্বেচ্ছায় এটা সম্পূর্ণভাবে করতে সক্ষম। অন্য প্রাণীরা—পোষা প্রাণী ও পোকা যারা সকল জলবায়ুতে অভ্যস্ত হয়েছে, তারা স্বাধীনভাবে নয় বরং মানুষের নিয়ন্ত্রণে হয়েছে। মানুষের আদিবাস যে সুষম উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল, সেখান থেকে ঠান্ডা এলাকায়—যেখানে বছর গ্রীষ্ম ও শীত এই দুইভাগে বিভক্ত—গমন নতুন প্রয়োজন সৃষ্টি করেছেঃ শীত ও স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে আশ্রয় ও কাপড়ের প্রয়োজন, তাই শ্রমের নতুন ক্ষেত্র আর নতুন ধরণের তৎপরতা মানুষকে প্রাণী থেকে ক্রমেই আরো বেশি আলাদা করে দিল।

বহু সহস্র বছরে নরবানর থেকে মানুষে রূপান্তরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের হাত অভিযোজন করতে যে কাজগুলো ক্রমান্বয়ে শিখেছে তা হয়ত খুবই সহজ সরল ছিল। সর্বাধিক বর্বর, যাদের শারিরীক অবনতি ঘটে পশুদের অবস্থায় অধোগতি ঘটেছে বলে অনুমান করা হয়, তারাও অন্তর্বর্তীকালীনদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। মানুষের হাত দিয়ে প্রথম পাথর থেকে ছুরি বানানোর আগে যে দীর্ঘ যুগ পেড়িয়ে এসেছে তার তুলনায় আমাদের জানা ইতিহাসের কালপর্ব অনেক নগন্য মনে হবে। কিন্তু নির্ধারক পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছিল, *হাত মুক্ত হল* এবং তারপর থেকে আরো বেশি বেশি নৈপুণ্য অর্জন করতে থাকল; আরো উন্নততর নমনীয়তা যা অর্জিত হল তা বংশানুক্রমে চলল আর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বেড়েই চলল।

তাই হাত শুধু শ্রমের অঙ্গই নয়, *শ্রমের ফসলও বটে।* কেবল শ্রমের মাধ্যমেই, নতুন নতুন কাজের মাধ্যমে, পেশি, রগ, আর দীর্ঘ সময়কালে হাড় বিশেষ বিকাশের মধ্য দিয়ে গেছে এবং নয়া অধিক থেকে অধিকতর জটিল কাজের মধ্যে এই বংশানুক্রমে প্রাপ্ত সামর্থের মাধ্যমে মানুষের হাতকে এতটা উচ্চ মাত্রায় নিঃখুঁত করে তুলেছে যে সে রাফায়েলের চিত্রকলা, থরভ্যাল্ডসেনের ভাস্কর্য আর পাগানিনির সঙ্গীতের মত আশ্চর্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু হাত একা অস্তিত্বশীল ছিলনা, এটা ছিল উচ্চমাত্রার জটিল অখন্ড জীবকাঠামোর অংশ মাত্র। আর হাতকে যা লাভবান করেছে তা হাত যে-সমস্ত শরীরকে সেবা করে তাকেও সেবা করে। আর তা দুইভাবে।

প্রথম, ডারউইন যাকে বলেছেন বিকাশের আন্তসম্পর্কের নিয়ম। এই নিয়ম বলে যে, কোন জীবের বিশেষায়িত ধরণের পৃথক অংশগুলি বিশেষ ধরণের অন্য

অংশের সাথে যুক্ত, যার সাথে কোন সংযোগই বাহ্যত দেখা যায়না। তাই যে সকল জীবে লোহিত রক্তকণিকা রয়েছে কোষকেন্দ্র ছাড়া, যাদের মেরুদন্ডের প্রথম কশেরুকা মাথার সাথে যুক্ত আছে দ্বৈত বাঁধনে বাঁধা মাধ্যমে, বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সন্তানদের দুধ খাওয়ানোর জন্য স্তনগ্রন্থি রয়েছে। একইভাবে স্তন্যপায়ীদের খুর থাকাটা তাদের বহুকক্ষবিশিষ্ট পাকস্থলী থাকার সাথে সম্পর্কিত জাবর কাটার জন্য। দেহের একাংশে কিছু ধরণের পরিবর্তন শরীরের অন্য অংশে বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন ঘটায়, যদিও এই সম্পর্ককে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারিনা। নীল চোখের পুরো সাদা বিড়ালেরা সর্বদাই, অথবা প্রায় সর্বদাই বধির। মানুষের হাতের ক্রমান্বয়ে নিখুঁত হওয়া, আর সোজা দাঁড়িয়ে চলাফেরার জন্য উপযুক্ত পায়ের অভিযোজন সন্দেহাতীতভাবে এমন আন্তসম্পর্কের গুণে জীবদেহের অন্যান্য অংশে প্রতিক্রিয়া করে। এই বিষয়টিকে সাধারণ সূত্রে প্রকাশের চেয়ে বেশি কিছু করতে সক্ষম হওয়ার মত পর্যাপ্ত তদন্ত এই বিষয়টির ওপর চালানো যায়নি।

বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শরীরের অন্যান্য অংশের উপর হাতের বিকাশের প্রত্যক্ষ ও প্রদর্শনযোগ্য প্রভাব। এটা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে যে আমাদের বানর পূর্বপুরুষেরা ছিল যূথবদ্ধ। সকল প্রাণীদের মধ্যে সর্বাধিক সামাজিক যে মানুষ, তাকে যূথবদ্ধ নয় এমন নিকট পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনুসন্ধান করা একেবারেই অসম্ভব। হাতের বিকাশের সাথে, শ্রমের সাথে প্রকৃতির উপর যে আধিপত্য শুরু হয়েছে তা প্রতিটি নতুন বিকাশের সাথে মানুষের নতুন দিগন্ত প্রসারিত করে দিল। সে অব্যাহতভাবে নতুন নতুন প্রাকৃতিক বস্তুর গুণাবলী আবিষ্কার করছিল যা আগে অপরিচিত ছিল। অন্যদিকে শ্রমের বিকাশ পারস্পরিক সমর্থন ও যৌথ কর্মকান্ড ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলার মাধ্যমে, আর প্রতিটি ব্যক্তির কাছে এই যৌথ

আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনকে বিচার করে, আর আদিমতম ঐতিহাসিক মানুষের এবং সমকালীন অসভ্যতমদের জীবনযাত্রা বিচার করে। সেগুলো হচ্ছে শিকার ও মাছ ধরার হাতিয়ার, শিকারের হাতিয়ার একইসাথে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার হত। শিকার ও মাছ ধরা থেকে অনুমিত হয় সম্পূর্ণ উদ্ভিজ্জভোজী থেকে এর সাথে মাংসভোজীতে রূপান্তর, আর এ ছিল নরবানর থেকে মানুষে রূপান্তরে আরেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মাংশাসী খাদ্যে জীবের পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় জরুরী উপাদান প্রায় প্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া যায়। হজমের প্রয়োজনীয় সময়কালকে কমিয়ে আনার মাধ্যমে এটা উদ্ভিদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য উদ্ভিদসুলভ শারীরিক প্রক্রিয়াকে সংক্ষিপ্ত করে, আর এভাবে প্রাণীর জীবনের যথার্থ সক্রিয় অভিব্যক্তির জন্য আরো সময়, বস্তু ও আকাঙ্খা অর্জিত হল। মানুষ যত উদ্ভিদ জগত থেকে উচ্চতর দিকে যাত্রা করে, ততই সে প্রাণীর ঊর্ধে উঠতে থাকে। মাংসাশী খাদ্যের পাশাপাশি উদ্ভিজ্জ খাদ্যে অভ্যস্ত হওয়া যেমন বনবিড়াল ও কুকুরকে মানুষের সেবকে পরিণত করেছে, তেমনি উদ্ভিজ্জভোজী খাদ্যের পাশাপাশি মাংসাশী খাদ্যে অভিযোজন মানুষের বিকাশে দৈহিক শক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনে বিরাটাকারে অবদান রেখেছে। যাহোক, মাংসাশী খাদ্যের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে মস্তিষ্কের ওপর, যা এখন এর পুষ্টি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করার মাধ্যমে অনেক সমৃদ্ধতর গতি সৃষ্টি করেছে, আর তাই তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আরো দ্রুত ও নিখুঁতভাবে বিকশিত হতে পারল। উদ্ভিজ্জ খাদ্যের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেও বলতে হয়, মানুষ মাংসাশী খাদ্য ছাড়া অস্তিত্বশীল হয়নি। আর মাংসাশী খাদ্য, আমাদের জানা সকল জাতির মধ্যে কখনো বা কোন সময় যদি নরমাংস ভোজন (বার্লিনবাসীর পূর্বপুরুষ ভ্লেটাবিয়ান অথা ভ্লিজিয়ানেরা

এলাকা জয় করতে তারা স্থানান্তরে যেত ও সংগ্রাম করত, কিন্তু সেখানে নিজেদের মলমূত্র দ্বারা অজান্তে মাটিকে উর্বর করা ছাড়া প্রকৃতি তাদের যা দিত তার বেশী আহরণে তারা অক্ষম ছিল। সম্ভাব্য সকল খাদ্য সংগ্রহ এলাকা দখল হয়ে গেলে বানরদের জনসংখ্যা আর বাড়তে পারতনা, বড়জোর একই থেকে যেত। কিন্তু সকল প্রাণীই প্রচুর পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য নষ্ট করে, সেই সাথে খাদ্য সরবরাহের পরবর্তী ফসলকে বীজেই নষ্ট করে। শিকারীর মত নেকড়ে অন্তসত্বা হরিণীকে রেহাই দেয়না। গ্রীসে ছাগলেরা বড় না হতেই ঝোপঝাড় খেয়ে ফেলে দেশের পাহাড়গুলিকে উজার করে ফেলে। প্রাণীদের এই "শিকারী অর্থনীতি" প্রজাতিসমূহের ক্রমিক রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, স্বাভাবিকের চেয়ে অন্য খাদ্যের সাথে অভিযোজনে বাধ্য করে, যার মাধ্যমে তাদের রক্ত এক ভিন্ন রাসায়নিক উপাদান পায় এবং সমগ্র শারীরিক গঠন ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়। আর একদা প্রতিষ্ঠিত যে সকল প্রজাতি অনভিযোজিত থাকে তারা বিলুপ্ত হয়। কোন সন্দেহ নেই নরবানর থেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের মানুষে রূপান্তরে শিকারী অর্থনীতি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। নরবানরদের এই প্রজাতি অন্য সকলকে বুদ্ধিমত্তা ও অভিযোজন ক্ষমতায় অনেক দূর অতিক্রম করেছে, এই শিকারী অর্থনীতি অবশ্যই অব্যাহতভাবে খাদ্য হিসেবে ব্যবহারযোগ্য উদ্ভিদের সংখ্যা অব্যাহতভাবে বাড়িয়েছে এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্যের ভোজ্য অংশ খাওয়াও অধিক থেকে অধিকতরভাবে বাড়িয়েছে। সংক্ষেপে খাদ্য হয়েছে আরো বেশি বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাই শরীরেও ঢুকেছে এমন সকল দ্রব্য যা ছিল মানুষে রূপান্তরে রাসায়নিক পূর্বশর্ত। কিন্তু সেসব তখনো শ্রম ছিলনা সত্যি বলতে। হাতিয়ার তৈরির মাধ্যমে শ্রমের সূচনা ঘটে। সবচেয়ে প্রাচীন হাতিয়ার কোনটা আমরা পাই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বংশানুক্রমে প্রাপ্ত যে সামগ্রীগুলো

কর্মকান্ডের লাভ পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে সমাজের সদস্যদের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হতে আবশ্যিকভাবে সাহায্য করে। সংক্ষেপে, মানুষ গড়ে ওঠার পথে এই পর্যায়ে এসে পৌঁছল যখন *একে অপরের প্রতি তাদের কিছু বলার প্রয়োজন হল*। প্রয়োজন অঙ্গ সৃষ্টি করে, নরবানরের অবিকশিত স্বরযন্ত্র ধীরে কিন্তু স্থিরগতিতে স্বরের দোলন দ্বারা অব্যাহতভাবে উন্নততর সুরে বিকাশের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় এবং মুখের অঙ্গগুলি ক্রমান্বয়ে শিখে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ধ্বনি তৈরি করতে।

প্রাণীদের সাথে তুলনায় শ্রম থেকে ও শ্রমের প্রক্রিয়ায় ভাষার উদ্ভবের এই ব্যাখ্যাই একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা প্রমাণিত হয়। এমনকি সর্বাধিক উচ্চবিকশিত প্রাণীদেরও একে অপরের সাথে সামান্য যোগাযোগের জন্যও স্পষ্ট বক্তব্য দরকার পড়েনা। প্রকৃতির রাজ্যে কোন প্রাণীই অনুভব করেনা কথা বলতে না পারার অথবা মানুষের ভাষা বুঝতে না পারার পঙ্গুত্ব। মানুষ কর্তৃক পোষা হলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। মানুষের সাথে যুক্ত হয়ে কুকুর ও ঘোড়া স্পষ্ট কথা শোনার জন্য এত সুন্দর কান গড়ে তুলেছে যে তারা সহজেই তাদের ধারণার সীমার মধ্যে যে কোন ভাষা সহজেই বুঝতে শেখে। অধিকন্তু মানুষের প্রতি মমতা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি অনুভব করার ক্ষমতাও তারা অর্জন করেছে, যা পূর্বে তাদের কাছে অজানা ছিল। এই প্রাণীদের সাথে যাদের ভাল সম্পর্ক আছে তাদের এই বিশ্বাস না হয়ে পারেনা যে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যা থেকে বোঝা যায় যে, *আজকাল* তারা কথা বলতে না পারাকে একটা দুর্বলতা মনে করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার প্রতিকারের আর কোন সম্ভাবনা নেই কারণ এদের স্বরযন্ত্রগুলি একটি নির্দিষ্ট ধরণে অতিমাত্রায় বিশিষ্ট হয়ে গেছে। যাইহোক, যেখানে স্বরযন্ত্র অস্তিত্বশীল, কিছু সীমার মধ্যে এই দুর্বলতা মিলিয়ে যায়। পাখির মুখ গহবরের অঙ্গগুলি মানুষের চেয়ে অনেক অনেক ভিন্ন,

তবুও পাখিরা হচ্ছে একমাত্র প্রাণী যারা কথা বলতে শেখে। আর টিয়া হচ্ছে সেই পাখি যে তার জঘন্য স্বর সত্ত্বেও সবচেয়ে ভাল কথা বলতে পারে। টিয়া যা বলে তা যে সে বুঝতে পারেনা এ ব্যাপারে আসুন আপত্তি না তুলি। এটা সত্য যে স্রেফ কথা বলার আনন্দ ও মানুষের সাহচর্যের জন্যই টিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা অবিরত মুখস্ত বুলি বারংবার আওড়ায়। কিন্তু তার ধারণার সীমার মধ্যে সে যা বলে তা সে বুঝতে শিখতে পারে। টিয়াকে শিক্ষা দেন এমনভাবে কথার শপথ নিতে যাতে সে একটা ধারণা পায় তার অর্থের (গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চল থেকে ফেরা নাবিকদের এটা ছিল একটা অন্যতম আনন্দ), তাকে উত্যক্ত করুন, আর আপনি শীঘ্রই দেখবেন সে তার বুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করছে যেন সে বার্লিনের ফেরিঅলা। মুখরোচক খাবার চাওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য।

প্রথমে শ্রম, তারপর এর সাথে কথা বলা, এই দুটি ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা যার প্রভাবে নরবানরের মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে মানুষের মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হল যা তার সকল সাদৃশ্য সত্ত্বেও অনেক বেশি বড় ও অধিক নিখুঁত। মস্তিষ্কের বিকাশের সাথে হাতে হাত ধরে তার সর্বাধিক নিকট হাতিয়ার ইন্দ্রিয় অঙ্গগুলির বিকাশ ঘটল। কথা বলার ক্রমান্বয় বিকাশের সাথে যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ কথার শোনার অঙ্গের পরিশোধন হতে থাকল, তেমনি সামগ্রিকভাবে মস্তিষ্কের বিকাশের সাথে হয়েছিল সকল ইন্দ্রিয়ের পরিশোধন। ঈগল মানুষের চেয়ে অনেক দূর দেখতে পায়, কিন্তু মানুষের চোখ ঈগলের চোখের চেয়ে কোন জিনিসের অনেক বেশি কিছু দেখে। মানুষের চেয়ে কুকুরে ঘ্রাণানুভূতি অনেক প্রখর, কিন্তু মানুষ গন্ধের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস পার্থক্য করার ক্ষমতা রাখে যার একশ ভাগের এক ভাগও কুকুরের নেই।

নরবানরেরা তাদের স্থূলতম আদি রূপে স্পর্শানুভূতি খুবই কম পায় যা শ্রমের মাধ্যমে খোদ মানুষের হাতের বিকাশের সাথেই কেবল বিকশিত হয়।

মস্তিষ্ক ও তার সাথী ইন্দ্রিয়সমূহের বিকাশ, সচেতনতার বাড়ন্ত স্বচ্ছতা, বিমূর্তায়ন ও সিদ্ধান্ত টানার ক্ষমতার বিকাশ শ্রম ও কথার উপর প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে তার আরো বিকাশে চিরপ্রেরণা দেয়। এই বিকাশ তখনই উপসংহারে পৌঁছেনি যখন মানুষ চূড়ান্তভাবে নরবানর থেকে পৃথক হল, বরং সমগ্রভাবে বিপুল উন্নতি ঘটিয়ে চলে, তারা মাত্রা ও দিক ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী ও ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন হয়েছে। আবার এখানে সেখানে স্থানীয় অথবা অস্থায়ী পশ্চাদগতি দ্বারা এই বিকাশের গতি ব্যাহতও হয়েছে। অন্যদিকে পূর্ণাঙ্গ মানুষের আবির্ভাবের সাথে *সমাজ* নামে নতুন একটি উপাদানের আবির্ভাব ঘটে যা এই বিকাশকে একদিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবল পেরণা দিয়েছে, অন্যদিকে দিয়েছে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা।

গেছো নরবানরের দল থেকে মানব সমাজের উদ্ভবের আগে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেছে যে সময়কালের গুরুত্ব মানুষের জীবনের এক সেকেন্ডের চেয়ে বেশি নয় *[এঙ্গেলসের নোটঃ এক্ষেত্রে একজন নেতৃত্বকারী কর্তৃত্ব হচ্ছে স্যার উইলিয়াম থমসন, যিনি হিসেব করে বের করেছেন যে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বসবাসযোগ্য পৃথিবীর জন্য পর্যাপ্ত ঠান্ডা হওয়ার পর ১০ কোটি বছরেরও কিছু বেশি সময় কেটে গেছে]*। শেষ পর্যন্ত তার আবির্ভাব ঘটল। আমরা নরবানরদের একটি দল ও মানব সমাজের মধ্যে পুনরায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোন পার্থক্য দেখতে পাই? তা হল শ্রম। ভৌগলিক পরিস্থিতি অথবা প্রতিবেশী পালের প্রতিরোধের ফলে নির্ধারিত একটা খাদ্যাঞ্চলে চরে বেড়িয়েই নরবানরদের পাল সন্তুষ্ট ছিল। নতুন খাদ্যসংগ্রহ